দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 21 MAR 1993

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রসঙ্গঃ বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ সংশোধন

সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইন

কালো আইনের ঘন অন্ধকার বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এলো বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩। একটা নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূলনীতি এবং রাজনীতির মূল ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই রচিত হয়েছিল এর কাঠামো। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন, সিনেট (১৯২০-এর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের স্থলে), সিন্ডিকেট, একাডেমিক পরিষদ, অনুষদ সবখানেই প্রবর্তিত হলো নির্বাচন প্রথা, সবগুলোকেই দেয়া হলো প্রতিনিধিত্বকারী রূপ। শিক্ষক অফিসারদের নিষেধের শৃংখল মোচন হলো। স্বস্তি ফিরে এলো বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে। ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের ক্ষেত্রে একজন নয়, অনেক জনের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হলো।

শিরোনাম ভিন্ন হলেও গত রোববারের কলামের ধারাবাহিকতায়ই আজকের এই কলাম। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশকৃত সুপারিশে শুধু শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতির কথা বলেনি, বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩-এর পরিবর্তন প্রসঙ্গও তাতে উত্থাপিত হয়েছে। পরিবর্তন প্রসঙ্গে পরিষদের সুপারিশঃ "বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ পদ্ধতি, অনুষদের ডীন নির্বাচন এবং সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র কর্মচারীদের বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত করেছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম এবং গবেষণা মারাত্মক-ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনয়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করলে পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে।"

'৭৫-এ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ পরিবর্তনের আলাপ-আলোচনা নানা মহলে শুরু হয়। এ বেসামরিক ব্যুরোক্র্যাট মহল প্রথম থেকে আদেশটিকে সুনজরে দেখেনি,- এর অন্তর্নিহিত গণতান্ত্রিক গন্ধটাই বুঝি তাদের নাকে কেমন লাগছিল। এর সঙ্গে যোগ হলো স্বেচ্ছাচারী মহল। পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয় সমাজের প্রতিবাদের মুখে উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন সম্ভব হয়নি কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্র ব্যতীত এবং তা হলো চ্যান্সেলরের দায়িত্ব সম্পর্কিত '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের দশম ধারা। এই ধারার (৩) উপধারার পরে নতুন উপধারা (৪) সংযোজন করা হলো যার ফলে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে চ্যান্সেলর হিসেবে তার ক্ষমতা অন্য কোনও ব্যক্তির উপর অর্পণ করতে পারবেন। পরবর্তী এরশাদ আমলে '৭৩-এর আদেশের উপর সংশোধনী নামক প্লাস্টিক সার্জারীর উদ্যোগ আয়োজন চললো পুরোদমে। এর ফলে '৭৩-এর আদেশের নাম এবং খোলসটা হয়তো থেকে যেতো কিন্তু আমাদের সংবিধানের মতো বহুবিধ সার্জারীর ফলে চেহারাটাই চেনা যেতো না। বহুজনের শুভেচ্ছা বহনকারী '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ দ্বিতীয়-বারের মতো বেঁচে গেল অস্ত্রোপচার থেকে। সার্জারী শুরু হবার আগেই সে আমলের শেষ ঘনিয়ে এলো, পতন ঘটলো। এবার এ নিয়ে আবার গুঞ্জন উঠেছে এবং তা উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় পরিমন্ডল থেকেই।

না, আমি পরিবর্তনবিরোধী নই। বেঁচে থাকতে হলে জীবনের সবক্ষেত্রেই পরিবর্তন মেনে চলতে হবে, পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে হবে। পরিবর্তন না মানা তো মৌলবাদী ব্যাধিগ্রস্ত হবার লক্ষণ। তবে পরিবর্তন কতটুকু কল্যাণকর তা পরিমাপ করে নিয়ে একাজে এগুতে হবে। অতীতের কোন বিধিবিধানে, ব্যবস্থায়, বিশ্বাসে, ধ্যান-ধারণায় যদি কিছু সুন্দর, সুস্থ, কল্যাণকর, যুক্তিসম্মত এবং বহুর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে থেকে থাকে তবে তাকে বিসর্জন দিয়ে, বাদ দিয়ে কোন পরিবর্তন মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না এবং তা অভীপ্সিতও নয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের মতে গত বিশ বছর যাবৎ প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩-এর "কোন কোন ধারায় ত্রুটি প্রায় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।" এ সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে প্রথমে এই আদেশের পূর্ববর্তী বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যেসব আইন এবং আদেশ-অধ্যাদেশ প্রবর্তন করা হয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা নেয়া দরকার। কারণ তাতে বৃটিশ, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আমলে জারিকৃত বিশ্ববিদ্যালয় আইন-আদেশ-অধ্যাদেশগুলোর তুলনামূলক একটা চিত্র আমাদের চোখে ধরা পড়বে। শুধু তাই নয়, '৭৩-এর আদেশের কোন ধারা কি কারণে এবং কোন্ পরিস্থিতিতে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে, কিংবা সত্যিকার অর্থে এগুলো কতটুকু অবাঞ্ছিত এবং আদৌ অবাঞ্ছিত কি না তার মূল্যায়ন সহজ হবে।

তৎকালীন বৃটিশ পূর্ববঙ্গে এবং আজকের বাংলাদেশে প্রবর্তিত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় আইন বৃটিশ প্রণীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯২০। ঐ আইন ছিল ঔপনিবেশিক প্রভুদের অনুগ্রহের নিদর্শন, দয়ার দান। এই আইনের বলে আমরা পেলাম এদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় 'অটোনমি' বা স্বায়ত্তশাসন অধিকার কতটুকু স্বীকৃত হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত পরিষদ-উপপরিষদে শিক্ষক কিংবা এদেশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব কি ধরনের, এবং কতটুকু নেয়া হয়েছিল তা নিয়ে বিচার, বিশ্লেষণের কথা সেদিন কারও মনে হয়নি এবং সে-সুযোগও বুঝি ছিল না। অবহেলিত এই অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হলো, এ-ই ছিল সেদিনের সবচেয়ে বড় কথা, সবচেয়ে বড় পাওয়া। তাছাড়া, সেদিনের দেশ ও সমাজ আজকের মতো অধিকার সচেতন ছিল না। সচেতনতা যেটুকু ছিল, তা সীমাবদ্ধ ছিল বিশেষ এক শ্রেণীর মধ্যে। আজ প্রায় সত্তর বছর পর বিশের দশকের রাজনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতি এবং ঔপনিবেশিক শাসনসুলভ সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে ১৯২০-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি বিচার করলে দেখা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বশাসনাধিকার কিংবা শিক্ষক ও বৃহত্তর সমাজের প্রতিনিধিত্ব এবং নির্বাচন প্রথার প্রশ্নে ১৯২০-এর আইনপ্রণেতারা তথা ব্রিটিশ শাসকরা তাদের উত্তরসূরি পাকিস্তানী শাসকদের মতো অনুদার এবং নির্মম ছিলেন না। ১৯২০'র আইনটির পাশাপাশি ৪১ বছর পরের পাকিস্তানী আমলের ১৯৬১'র বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ রাখলে এই সত্যটিই চোখে ধরা পড়ে। ১৯২০ সালে এ ব্যাপারে যারা উদ্যোগ নিয়েছিলেন, অবদান রেখেছিলেন তাদের অনেকেই শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক হিসেবে ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেগুলোর অনুকরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯২০-এ বিশ্ববিদ্যালয় Authority বা কর্তৃপক্ষ গঠনে একদিকে যেমন নিয়োগ, মনোনয়ন বা পদাধিকার বলে সদস্যভুক্তির প্রথা ছিল ও এ সম্পর্কিত ধারা উপধারার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ব্রিটিশ প্রভুদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য অক্ষুণ্ন ও নিশ্চিত রাখার ব্যবস্থা ছিল এবং নন-ইউরোপীয়ন অর্থাৎ এদেশীয় সদস্যগণ বা প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে মোহামেডান নন্-মোহামেডান বিভাজন সৃষ্টি করে শাসকের সুবিধার্থে একটা ভারসাম্য রক্ষার দিকে সজাগ দৃষ্টি ছিল, অন্যদিকে তেমনি স্বশাসনাধিকার বা শিক্ষক ও বৃহত্তর সমাজের প্রতিনিধিত্ব এবং নির্বাচন প্রথাও অনুপস্থিত ছিল না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। দু'একটি উদাহরণ দিলেই একটা রক্ষণশীল কাঠামোর মধ্যেও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর, অটোনমি এবং প্রতিনিধিত্বশীলতার প্রতি ইতিবাচক অনুভূতির পরিচয় কিঞ্চিৎ পরিমাণে হলেও পাওয়া যাবে। এই আইনের ১০(১) ধারামতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বা নির্বাহী পরিষদের সুপারিশ বিবেচনান্তে (after consideration of the recommendations of the Executive Council) চ্যান্সেলর (প্রাদেশিক গভর্নর) ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত করবেন। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, একদিকে যেমন ব্রিটিশ গভর্নরের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে সুপারিশ মেনে নেয়ার বাধ্যবাধকতা প্রত্যক্ষভাবে তার ওপর আরোপ না করে, অন্যদিকে সুপারিশ বিবেচনায় এনেই নিয়োগ দানের কথা বলা হয়েছে। ফলে, কার্যত এই সুপারিশের ভিত্তিতেই ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত করা হতো। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে কোর্ট, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এবং একাডেমিক কাউন্সিল- এই তিনটি পরিষদ গঠনে পদাধিকার বলে সদস্যভুক্তি, নিয়োগ এবং নির্বাচন- তিনরকম ব্যবস্থাই ছিল। কোর্টে চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলর, টেজারার, রেজিস্ট্রার, প্রভোস্ট এবং অধ্যাপক ও রীডার (সহযোগী অধ্যাপক)রা থাকতেন পদাধিকার বলে। এছাড়া ২(১) সংবিধিতে নির্দিষ্টকৃত পদাধি-কারী আরও সদস্য ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন গভর্নরের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, জনশিক্ষা পরিচালক, প্রাদেশিক কৃষি ও শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরদ্বয়, ঢাকা বিভাগের কলেজ-সমূহের অধ্যক্ষবৃন্দ। নির্বাচিত সদস্য হিসেবে থাকতেন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের মধ্য থেকে তাদের নির্বাচিত ৩০ জন প্রতিনিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত পাঁচজন লেকচারার। অবশ্য রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন ১৫ জন মহামেডান এবং ১৫ জন নন-মহামেডান- এই দু'ভাগে হতো। এই ৩৫ জন নির্বাচিত এবং প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যের বিপরীতে ছিল চ্যান্সেলরের নিয়োগকৃত ৪০ জন সদস্য, তবে এ সদস্য নিয়োগ এমনভাবে করতে হবে যাতে যতদূর সম্ভব কোর্টের নন-ইউরোপীয়ন বা এ দেশীয় সদস্যবৃন্দের মধ্যে অর্ধেক সংখ্যক সদস্য মোহামেডান হন। এই আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কোর্ট সিংহভাগ নিয়োগকৃত এবং পদাধিকারী সদস্যদের নিয়ে গঠিত হলেও সেখানে অন্তত সিকি ভাগ নির্বাচিত সদস্য ছিল। অনুরূপভাবে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলেও কোর্টের নির্বাচিত ২ জন মহামেডান, ২ জন নন-মহামেডান সদস্য থাকার ব্যবস্থা ছিল। একাডেমিক কাউন্সিল গঠিত হতো প্রধানত অনুষদের ডীন, বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক, প্রভোস্ট এবং লাইব্রেরীয়ানকে নিয়ে। এদের সঙ্গে চ্যান্সেলরের নিয়োগকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নন এমন অনূর্ধ্ব তিনজন বিশেষজ্ঞ থাকতেন। এই একাডেমিক কাউন্সিল তিনজন রীডার এবং দু'জন লেকচারারকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করে নিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কর্তৃপক্ষ হিসেবে গণ্য হতো অনুষদ। তার ডীন অনুষদের অন্তর্গত বিভাগীয় প্রধানদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। এভাবেই নিয়োগ নির্বাচনের মিশ্রণে রচিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সাংগঠনিক রূপ। এর উপর আঘাত এলো পাকিস্তানী আমলে। সর্বগ্রাসী এবং সব অধিকার হরণকারী দানবরূপে এলো ১৯৬১'র অধ্যাদেশ যা 'বিশ্ববিদ্যালয় কালাকানুন' বলে আখ্যাত। বিলুপ্ত হলো কোর্ট, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বদলে এলো সিন্ডিকেট। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনাকারী সব পরিষদ উপ-পরিষদে নির্বাচন প্রথা নির্বাসিত হলো। ব্রিটিশ শাসকের দাক্ষিণ্যে পাওয়া স্বায়ত্তশাসন বা প্রতিনিধিত্বশীলতার যে শীর্ণ ছায়াটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো ঘিরে ধীরে ধীরে কায়া নিয়ে গড়ে উঠছিল তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, পাকিস্তানী আমলে স্থাপিত এ দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই কালাকানুনের অপছায়ায় আবৃত হলো। একাডেমিক স্বাধীনতার পরিবর্তে শিক্ষকদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হলো ধারা উপধারা দিয়ে। নানা নিষেধের জোয়াল নামলো তাদের কাঁধে। চ্যান্সেলর হিসেবে প্রাদেশিক গভর্নরকে দেয়া হলো ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের একক এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা- যে ক্ষমতা ব্রিটিশ গভর্নরের ভাগ্যেও জোটেনি। নিয়োগ বা নির্বাচন নয়, 'মনোনয়নে'র মাধ্যমে পাকিস্তানী শাসকরা এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে 'স্টিল ফ্রেম' বা ইস্পাত কঠিন কাঠামোতে, ছাঁচে ফেলতে উদ্যোগী হলো। এসব কিছুই নিশ্ছিদ্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। ষাট দশকে পৃথিবীর সব দেশেই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে উঠেছিল তা হলো বিশ্ববিদ্যালয় ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে, হাত দিতে হবে। কিন্তু ভয় লাগে হাত যদি পুড়ে যায়। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী হাত দিয়েছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজের আন্দোলনের আগুনে সে হাত পুড়ে গেল এবং এমনভাবে পুড়ে গেল যে তা দিয়ে এ দেশকে পাকিস্তানের সঙ্গে ধরে রাখা আর সম্ভব হলো না।

কালো আইনের ঘন অন্ধকার বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এলো বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩। একটা নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূলনীতি এবং রাজনীতির মূল ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই রচিত হয়েছিল এর কাঠামো। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন, সিনেট (১৯২০-এর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের স্থলে), সিন্ডিকেট, একাডেমিক পরিষদ, অনুষদ সবখানেই প্রবর্তিত হলো নির্বাচন প্রথা, সবগুলোকেই দেয়া হলো প্রতিনিধিত্বকারী রূপ। শিক্ষক অফিসারদের নিষেধের শৃংখল মোচন হলো। স্বস্তি ফিরে এলো বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে। ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের ক্ষেত্রে একজন নয়, অনেক জনের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হলো। এমনকি, বিভাগীয় প্রধান নিয়োগে অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক পর্যন্ত সিনিয়রিটি অনুসারে "রোটেশনে"র ব্যবস্থা রইলো। আজকে এই আদেশ পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রশ্ন উঠেছে। একথা স্বীকার্য, গত বিশ বছরে এ আদেশের বিধি-বিধানের মধ্যে অসঙ্গতি বা ত্রুটি ধরা পড়েছে, তার সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের প্রশ্ন সংশোধন করতে গিয়ে কি আমরা ফিরে যাব ১৯২০ সালে? তা সম্ভব নয়, অভিপ্রেতও নয়। তবে আমরা কি ফিরে যাব ১৯৬১তে, কালাকানুনের যুগে, সেই স্টীল ফ্রেমের যা পাকিস্তানী শাসকের চাপিয়ে দেয়া ইস্পাত কঠিন কাঠামোতে? ফিরে যাবো সেই আমলে যে আমলে অনুগত অনুদাসদের সাহায্যে পাকিস্তানী শাসকরা এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ন্ত্রণের অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়েছিল? কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছিল কারণ এদেশে স্বাধীনচেতা উদারনীতিক শিক্ষক, শিক্ষাবিদ বা শিক্ষাব্রতীদের অভাব ছিল না, অভাব ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শিক্ষকদের মতো দেশের জন্যনিবেদিতপ্রাণের।

পরিবর্তন-সংশোধন কি ধরনের হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা পরবর্তী কোন এক লেখায় করা যাবে। এখানে একটা কথা বলেই শেষ করছি। শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের জন্য যদি ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ পদ্ধতি বদলাতে হয় বা সিনেট সিন্ডিকেটে নির্বাচন প্রথা বাতিল করতে হয় তাহলে এটা আমাদের স্মরণে থাকা দরকার যে, এরশাদ সরকারের পতন ঘটানোর জন্য শুধু ছাত্র নয় শিক্ষকদেরও সক্রিয় ভূমিকার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। নেতা-নেত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে এসে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন, তাদের সহযোগিতা চেয়েছেন এবং পেয়েছেন, তাদের নিয়ে উত্তাল তরঙ্গ অতিক্রম করে নদীর এপারে এসেছেন। এখন পেছন ফিরে অন্য পারে যাওয়া সহজ নয়। কারণ ওপারে ফিরে যাওয়ার খেয়াতরী চলে গেছে।